ছিলেন ট্যাক্সি-ড্রাইভার...

দেবব্রত রায়

ছিলেন ট্যাক্সি-ড্রাইভার হয়ে গেলেন অভিব্যক্তির প্রাণপুরুষ। ইংরেজ থেকে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট, তৃণমূল, বিজেপি সব জমানাই তিনি দেখেছেন। সান্নিধ্য পেয়েছেন রামকিংকর থেকে প্রকাশ কর্মকারের মতো লিজেন্ড শিল্পীদের। তবুও তাঁর এক কথা—তাতে কী! সে তো গানেও জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ থেকে রাজ্যেশ্বর মিত্র ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য... সবার সঙ্গে আলাপ!

তারপর একটা আলগা হাসি।

দেশভাগের বেশ কয়েকবছর পর বগুড়া থেকে পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাটে চলে এসেছিলেন এই সম্ভ্রান্ত চক্রবর্তী পরিবারটি। ১৯৩৮ সালের ২৯শে মে সেই পরিবারেই জন্ম নেন উৎপল চক্রবর্তী। বালুরঘাটে অষ্টম-শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করে পরিবারের সঙ্গে তিনি মালদায় চলে আসেন। সেখানে কলেজের পড়াশোনা শেষ করে কর্মজীবন শুরু করেন ট্যাক্সি-ড্রাইভার হিসেবে। তার কিছুদিন পর তিনি স্থানীয় একটা প্রাথমিক-ইশকুলে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। একসময় শিক্ষকতার সে চাকরি ছেড়ে উৎপলবাবু বাণীপুরে প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষণ শিবিরে অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন, এবং সেখান থেকে ১৯৭০ এর দশকে চাকরিসূত্রেই তিনি ছান্দারে আসেন। পরবর্তীতে সে চাকরিও ছেড়ে উৎপলবাবু শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথিতে (১০ই মার্চ, ১৯৭৮) ছান্দারে অভিব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করেন।

আত্মজৈবনিক লেখার অনুরোধসহ পরামর্শে উৎপল চক্রবর্তী নাকি, যতটা সম্ভব ততটাই, বিস্মিত এবং যারপরনাই বিব্রত হয়ে শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক প্রভাত চৌধুরীকেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাঁর আত্মজীবনী কে পড়বে এবং কেনই-বা

পড়বে! জীবনসায়াহ্নে এসে হয়তো উৎপল চক্রবর্তী মনে করেছিলেন, আজকাল কেউ পড়তে চায় না। সময়টা দ্রুত এগিয়ে যাবার যুগ। পড়তে বসলেই, উঠতে দেরি হবে। বহুদূর যাওয়ার ইঁদুরদৌড়ে পিছিয়ে পড়বে সে! এবং পরিহাসছলে তিনি বলেছিলেন, শুনেছি ড. মেঘনাদ সাহা নাকি রসিকতা করে বলতেন—সব ব্যাদে (বেদ) আছে। আজকাল অনেকে বলেন সব ন্যাটে (নেটে) আছে। তাই কুন্ঠাজ্ঞানের বৈকুন্ঠে যেতে নাকি, আন্তর্জালই যথেষ্ট। সে জালেই সব ধরা আছে।

" তাহলে তোমার এই অভিব্যক্তি? "

এর উত্তরেও তাঁর সেই এক কথা। যা হবার নয়, তা কি কখনো হয়! ক্যাসেট ,সিডি, দূরদর্শন-কলকাতার মঞ্চে অনুষ্ঠান, অ্যাকাডেমিতে প্রদর্শনী, গানমেলায় বক্তৃতা, কবিতাপাঠ সবই হল, শেষ অবধি কিছুই কিছু নয়। কিছুই তো হল না— আবারও রবীন্দ্রনাথের সেই গানেই ফিরে যেতে হয়। এ-প্রসঙ্গে উৎপল চক্রবর্তী কবিতাপাক্ষিকের জন্য লেখা তাঁর আত্মজৈবনিকে লিখেছেন, বহুদিন আগে ঢুলী সিনেমায় বিকাশ রায়ের একটা সংলাপ ছিল— পাবলিসিটি ফার্স্ট, পাবলিসিটি সেকেন্ড, পাবলিসিটি লাস্ট। আজও কথাটা সত্যি। নইলে তৃতীয় শ্রেণির টিভি সিরিয়ালের চতুর্থ শ্রেণির অভিনেত্রী পাবলিসিটির জোরে আজ সেলিব্রিটি। এখন চৈত্র সেল। সস্তায় বিকোচ্ছে সব।

উৎপলবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল বিষ্ণুপুর উৎসবকে কেন্দ্র করে। তিনি সে সময় বিষ্ণুপুর উৎসবের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। মেলাপ্রাঙ্গণের মূল ফটক থেকে ইন্টিরিয়র ডেকোরেশন করার কাজে উৎপলবাবু এবং তাঁর অভিব্যক্তির ছেলেমেয়েরা দায়িত্ব নিয়েছেন একাধিকবার। তাঁর আমার সঙ্গে পরিচয় বিষ্ণুপুর উৎসবের সুভেনিরে লেখার মধ্য দিয়ে। পরে বলেছিলেন, যুবমানস পত্রিকাতেও তিনি আমার লেখা পড়েন। আমার লেখা ওঁর ভালো লাগে। তিনি ছান্দারে তাঁর অভিব্যক্তিতে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন অনেকবার। মোট চারবার আমি অভিব্যক্তিতে গেছিলাম। ভুল বললাম, অভিব্যক্তিসহ ছান্দার-কাদাকুলিতে গেছিলাম মোট পাঁচবার। শেষবার গেছিলাম ছান্দার কর্তৃপক্ষ এবং কবিতাপাক্ষিক পত্রিকার প্রবাদপ্রতিম সম্পাদক প্রভাত চৌধুরীর ডাকে।

সম্ভবত সালটা ছিল ২০১৬, উৎপলবাবুর বেঁচে থাকাকালীন তাঁর শেষ জন্মদিনে। দেখলাম সেই আড্ডাবাজ মানুষটা সবকিছুর থেকেই যেন একটু দূরে। ভাঁটার টানে নদী যেমন তার সমস্ত ঢেউ ফিরিয়ে নেয় শহর, বন্দরের সমস্ত হৈ-হুল্লোড়ের থেকে তেমনি তিনিও একটু-একটু করে নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন অনুরাগীদের ভিড় এবং আমাদের উৎপীড়ন থেকে। মনে হল এও এক আত্মমগ্নতার খোঁজ।

এই লেখা লিখতে গিয়ে মনে পড়ল তাঁর একটা আড্ডার রসিকতার কথা। আত্মজৈবনিকেও তার উল্লেখ আছে। তিনি মাঝেমধ্যেই আড্ডার ল্যাজামুড়োয় সেটা যোগ করতেন। বিষয়টা হল একটা রাজনৈতিক স্যাটায়ার। "একবার একটা মিটিংয়ে একজন কথায় কথায় বলেছিলেন—এখন মশাই পোচার চাই। কথাটা বুঝতে না-পেরে বললাম, পচার কী চাই? আর পচাটাই বা কে! শুনে সেই নেতা খেপে গিয়ে বললেন, ‘ধুর মশাই, পোচার মানে পাবলিসিটি।’ "

কার্টুন আঁকা তো দূর, দড়ি ধরে মার টান, বললেই রাজা-রানিরা চিরকালই এক-একজন মোগাম্বো হয়ে ওঠেন। আর তার মধ্যেই মকারিপ্রিয় (Mockery) মানুষের সংখ্যা আজকাল কড়ে গোনা হলেও, তাঁদেরই কেউ এক-আধজন যে আমাদের আশেপাশেই আছেন তা উৎপলবাবুর সঙ্গে আলাপ না-হলে বোঝা যেত না। পরিহাসছলে নিজেই নিজেকে উপহাস করে যা বলতেন এবং তাঁর আত্মজৈবনিকে লিখেছেন তা সরাসরি এখানে তুলে ধরলাম-" আমার ঘোরতর বিশ্বাস, আমি ধরাধর গোষ্ঠীর একজন। সারাজীবন একে ওকে ধরাধরি করেই যা কিছু অর্জন। বারেন্দ্রভূমিতেই জন্ম আমার। আবার শেষ জীবনে রাঢ় অঞ্চলে। "

এই পরিহাসের একটা বিশেষ কারণ আছে। শোনা কথা এবং বই মারফত জানাও যায় অতীতের সেন আমলে বল্লাল সেন কর্ণাটক থেকে পাঁচজন বাহ্মণকে আনেন গৌড়বঙ্গে। ওই পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিলেন ধরাধর। এই ধরাধরের এক ছেলে থেকে যান সেই সময়ের বারেন্দ্রভূমি পৌন্ড্রবর্ধনে। আর এক ছেলে ছন্দড় যান রাঢ়ভূমিতে। রাঢ়ের বিখ্যাত গবেষক মানিকলাল সিংহ মনে করেন ছন্দড়গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণদের বসতি-অঞ্চলই ছান্দার নামে পরিচিত হয়।

উৎপলবাবুর আদি বাড়ি ছিল সেই পুণ্ড্রবর্ধনের এক গ্রামে এবং কাজের কারণে তাঁকে আসতে হয়েছিল রাঢ়ে। তাঁর মতে এটা যেন ধরাধরের দুই ছেলের বংশধরেরা পুনর্মিলিত হল। ধরা দিল পরস্পরের কাছে।

শৈশব, কৈশোরের স্মৃতি হাতড়ে তাঁর বাবার প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, বাবার কাছ থেকে পেয়েছি সুখাদ্যের অভ্যাস কিন্তু সেসবের চেয়েও বেশি পাওয়া তিনটে জিনিস হল, এক, ওই পরিচ্ছন্নতা — সাবান। দুই তাঁর রসিকতা এবং উৎপলবাবুর তিন-নম্বর প্রাপ্তি, ওঁর বাবার লেখালেখির অভ্যাস। ওঁর বাবার ক্ষেত্রে যেটা পরবর্তীতে দারিদ্র্য সামলাতে- সামলাতে চাপা পড়ে গেছিল।

মায়ের বিষয়ে তিনি লিখেছেন মায়ের রঙ ছিল চাপা। কিন্তু তিনি সুশ্রী এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। গান জানতেন। বাড়িতে ওঁর মায়ের নাম লেখা একটা জার্মান-রিডের হারমোনিয়াম ছিল। তিনি সেটা বাজিয়ে গান গাইতেন। ছড়ার গান গেয়ে, মধুসূদনদাদার গল্প বলে শিশু উৎপলদের ঘুম পারাতেন। দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়তে গিয়ে কখনো-কখনো অধৈর্য হতেন। ঝগড়া, রাগ মেটাতেন সন্তানদের মেরে। তবে তাঁর মায়ের হাতের রান্নাগুলো ছিল অপূর্ব এবং তাদের নামকরণও ছিল অদ্ভুত। মেথি আদাবাটা দিয়ে পাবদামাছের শুক্ত, ল্যাটামাছের মাথা বেগুন মেথি আদা দিয়ে ভাঙাচোরা, ডালের মধ্যে কুমড়ো পাতা আলু বেগুন দিয়ে ডাল ফেলানি, মটর ডালবাটা পটল আদাবাটা দিয়ে চাপড়ঘন্ট আর মাংস!

শিল্পরসিক উৎপলবাবু ছিলেন তাঁর বাবার মতোই খাদ্যরসিকও। বিশেষ পারিবারিক কারণে সপরিবারে তাঁরা চলে আসেন মামার বাড়িতে। মামাবাড়ির ফুল ধূপের গন্ধ আর দেবদেবীর ছবিভরা একটা কুঠরিই যেন তাঁর মনে আধ্যাত্মবোধের বীজ পুঁতেছিল। স্মৃতিমন্থনে এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, এই যে আধ্যাত্ম-চেতনা, কবিতা লেখা, জাতপাত না-মানা, সংস্কৃতিবোধ, কল্পনাশক্তির বিকাশ, ভয়— এসব আমার ওই দুটো বাড়ি থেকেই পাওয়া।

শিল্পের ছাত্র হিসেবে তাঁর কোনও একাডেমিক সনদ ছিল না। কিন্তু তুখোড় শিল্প রসিক থেকে একেবারে মেঠোঘেটো-সাধারণ মানুষেরও উৎপল চক্রবর্তীকে ঘিরে ছিল অদম্য বিস্ময়, ভালোবাসা এবং কৌতুহল।

এক জ্যোতিষী তাঁর কপাল দেখে নাকি, বলেছিলেন, "আপনি রোজ একটি করে ফল খাবেন। " উৎপলবাবু তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তাতে কী ফল হবে?

জ্যোতিষী বলেছিলেন, "খুব বড়ো একটা কাজ করবেন আপনি।" যদিও হাস্যরস চাপাচুপি দেওয়ার অক্লান্ত পরিশ্রমে ব্যর্থ হয়ে তিনি প্রায়- নাটকীয়ভাবে জানাতেন, কিন্তু হায় কপাল, ডাক্তারের নির্দেশে শরীরে পটাসিয়াম সোডিয়ামের ব্যালেন্স রাখতে ফল খাওয়াটাও বন্ধ করে দিতে হল!

অটোগ্রাফের খাতায় সাহিত্যিক মনোজ বসু, উৎপলবাবুর একটা লেখা পড়ে পদ্যের আকারে লিখেছিলেন, অদূরকালে উৎপল চক্রবর্তী একজন মস্ত সাহিত্যিক হবেন এবং মরার পর তা তিনি দেখবেন। একবার বইমেলায় সাহিত্যিক দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, তোমাকে দেখলে মনে হয়, বড়ো কিছু করবে তুমি।

আজ এঁরা কেউ শারীরিকভাবে বেঁচে নেই। উৎপলবাবুও ২০১৭-র ২৮শে মে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এবং যে মানুষটা আত্মজীবনী লেখার অনিচ্ছায় বারবার পালিয়ে বেড়িয়েছেন,বারবার অনেকের বহু অনুরোধ-উপরোধ এড়িয়ে গেছেন, সেই উৎপলবাবু আজ শারীরিকভাবে আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু তাঁর ছাত্রছাত্রীরা আছেন, বেশকিছু অবহেলার চিহ্ন নিয়ে আজও অভিব্যক্তি এবং তাঁর কাটুম-কুটুম টিকে আছে। এরা সবাই সাক্ষী থাকছে, দু-হাজার ছাব্বিশেও মানুষ তাঁর বিষয়ে জানার জন্য উৎসুক। কলকাতার কেষ্টপুর থেকে অথপথ সাহিত্য-পত্রিকাকর্তৃপক্ষ তাঁকে নিয়ে এবার একটা বিশেষ সংখ্যা বের করার উদ্যোগ নিয়েছেন। অগণিত পাঠক তাঁর সম্পর্কে, তাঁর চারুকলার পারফেকশন জানতে এবং পড়তে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তাঁকে পড়া ও জানার আগ্রহে আমাদের কোনও হাটুরে তাড়াহুড়ো নেই এবং উৎপল চক্রবর্তীর চারু ও কারুকৃতির কল্যাণে আমরা হ্যামলিনের বাঁশিকেও অগ্রাহ্য করতে পারি।

তথ্যসূত্র :

ব্যক্তিগত আলাপচারিতা

কবিতাপাক্ষিক পত্রিকা